এক বৃদ্ধের একটি দিন

সমীর কুমার রায়

খোলা জানালা দিয়ে এক ঝাঁক রোদ্দুর ঘরে ঢুকছে। সেই রোদ্দুরে পায়ের নিম্নাংশ চুবিয়ে সুধাময় একটা কাঠের চেয়ারে বসে ছিলেন। দুচোখ বন্ধ।

অর্করা আজ এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। গতকাল রাতে অর্ক এসেছিল।

'বাবা, কাল আমরা চলে যাবো।'

সুধাময় ছেলের দিকে তাকান। এটা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিলনা। কয়েক বছর আগে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। তখনও স্ত্রী শকুন্তলা বেঁচে। তবে ক্যানসারে ভুগছিলেন। অর্ক একমাত্র সন্তান। মারা যাবার আগে তার বিয়ে দেখে যাবার জন্যে ভেতরে তীব্র আকুতি জেগেছিল। স্ত্রীর এই ইচ্ছার জন্যেই সুধাময় একটু বা তাড়াতাড়িই অর্কর বিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর শকুন্তলা আর বেশীদিন বাঁচেনি। পুত্র-বধু শ্বেতার সম্পর্কে সুধাময়ের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। তাঁকে পছন্দ করেনা। বোঝা মনে করে। বিভিন্ন সময়ে তার উচ্চারিত মন্তব্য তাঁকে এই ধারণাতেই নিয়ে গেছে। শুধু নিজের স্বামী আর সন্তান ছাড়া, শ্বশুরবাড়ির আর সবাই পর। স্বামী আর সন্তান নিয়ে আলাদা থাকার ইচ্ছে। এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুধাময় মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন।

'কোথায়?' নিরাসক্ত-ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তবু চাউনিতে বিদ্রুপের আভাস ছিল। ছেলের প্রতি। বৌয়ের চাপ সামলাতে পারলেনা?

'অফিস থেকে ফ্ল্যাট দিয়েছে।' অর্কর মাথা এখনও নীচু। এই বাবার কাছেই ছোটবেলায় কত আদর না পেয়েছে।

'ভালো।' হাসির আভাসটা সুধাময়ের দৃষ্টি থেকে সরে যায়নি।

শ্বেতা দরজার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। কান ছিল উৎকীর্ণ–দুজনের কথোপকথনের একটা শব্দও যাতে না মিস্ করে।
যা বাবা-ন্যাওটা ছেলে। মানুষ হয়নি। নিজের স্বামী সম্পর্কে তার এই ধারনা।

এবার সে ঘরের ভেতরে ঢোকে।
'আপনার ছেলের অফিসের নিয়ম হচ্ছে, বাবাকে রাখতে পারা যাবেনা। ও চেষ্টা করেছিল।'

সুদাময়ের মুখ এখন কঠিন হয়। পুত্রবধুর মুখের দিকে তাকান।

'নিয়ম যখন, মানতেতো হবেই।' মনে মনে সুধাময় ভাবেন, ভাগ্যিস শকুন্তলা এখন মৃত। নইলে বড্ড কষ্ট পেতেন। এই প্রথম তিনি স্ত্রীর মৃত্যুতে খুশি হন।

' আপনার ছেলে বাবা আপনার জন্যে ওল্ডহোমের ব্যাবস্থা করছে।'

'থাক বৌমা, আমার জন্য তোমাদের ভাবতে হবেনা। নিজেদের কথা ভাবো।'

এ-ঘরে বসে সুধাময় ট্রাকে মাল তোলার শব্দ পান। মাঝে মাঝে ট্রাকের লোকদের সঙ্গে অর্ক আর শ্বেতার কথাবার্তার টুকরো টুকরো অংশ শোনা যাচ্ছে। চোখ বুজে থাকেন। এই শব্দগুলি যদি কানে না আসতো, খুশি হতেন। কিন্তু তাতো হবার নয়।

হঠাৎ ডান হাঁটুতে ছোট, নরম মুখের স্পর্শ অনুভব করেন। আস্তে আস্তে চোখ খোলেন। বাবলু। তাঁর হাঁটুতে মুখ গুঁজে আছে। তিনি তার মাথার পেছনে হাত রাখেন।

বাবলু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।
'দাদু আমি তোমাকে ছেড়ে যাবোনা।'
সুধাময় ম্লানভাবে হাঁসেন, 'না বাবা, বাবা-মায়ের কথা শুনতে হয়।'

শীর্ণ,শিরা ফুটে ওঠা, কুঁচকানো চামড়া হাত দিয়ে তিনি নাতির চোখের জল মুছে দেন। বাবলুর কান্না আরো বাড়ে।
'ওরা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেনা কেন?'
' নিয়ম নেই, বাবা।' সুধাময়ের দু-চোখ জলে ভরে যায়। তবে তিনি দ্রুত নিজেকে সামলে নেন। শক্ত-ধাতের মানুষ। চট করে ভেঙ্গে পড়তে তাকে দেখা যায়না।

ঘন্টাখানেকবাদে শ্বেতা আর অর্ক ঘরে ঢোকে। শ্বেতা সামনে আর অর্ক পেছনে। অর্ক যেন বৌয়ের শরীরের পেছনে নিজের অস্তিত্বকে লুকোতে চায়। সেরকম মনে করা যেতে পারে।

প্রথমে শ্বেতা সুধাময়কে প্রণাম করে। তারপর অর্ক কুণ্ঠিত, বিষন্ন ভঙ্গিতে তাঁকে প্রণাম করে। তিনি শান্তভাবে বলেন, 'ভালো থেকো।'
'আমরা যাচ্ছি, বাবা,' শ্বেতা বলে। তিনি হাসেন।
সেই হাসি কি বলে, বোঝা কঠিন।

তারা চলে যাওয়ার পরে দরজায় খিল তুলে দেন। তারপর ফের সেই চেয়ারটায় এসে বসেন। এই বাড়িতে তিনি এখন একা। আর কখনও এখানে বাবলুর 'দাদু' ডাক শুনতে পাবেন না। অনেক্ষন চুপচাপ বসে থাকেন।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ রমলা আসে। ঠিকে কাজের মেয়ে। বাসন-মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, মোছা আর জামাকাপড় কাচা।

'চলে গেছে?' কণ্ঠস্বরে শ্লেষ। 'হ্যাঁ,' সুধাময় উত্তর দেন। তারপর নিজের শোয়ার ঘরের দিকে পা বাড়ান। ' কি বৌরে বাবা, বুড়ো শ্বশুড়কে একা ফেলে রেখে চলে গেলো। লজ্জা শরমে বাধলোনা? '

সুধাময় তখনো নিজের শোয়ার ঘরে পুরোপুরি ঢোকেনি। রমলার মন্তব্য শুনতে পেলেন। সেখান থেকে ঈষৎ উচ্চস্বরে বলেন, ' নিজের কাজ করো।' তিনি রমলার সহানুভূতির পাত্র হওয়া পছন্দ করেন না। নিজের দুঃখ নিজের কাছে রাখবেন।

অনেকটা লম্বা ঝিল। পরিষ্কার, টলটলে হল। একটুকরো ময়লা চোখে পড়েনা। চারদিকে পাড়ে বসার জন্য সিমেন্টের পাকা বেঞ্চ। মাঝেমাঝেই। এলাকার মানুষেরা ভোরে, সকালে, পড়ন্ত বিকেলে এবং গোধূলিতে এসে বসে। সময় কাটায়। গল্প গুজব করে।

রমলা কাজ সেরে চলে যায়। সুধাময় ধুতি-পাঞ্জাবী পরে এবং হাতে লাঠি নিয়ে, দরজার বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে, গোধূলিতে সেই ঝিলের পাড়ে রোজকার মতন আসেন। নির্দিষ্ট বেঞ্চে এসে প্রতিবেশী বংকুবিহারীকে দেখেন। পাশে বসেন।

‘ আপনার ছেলে আর ছেলের বৌকে আজ দেখলাম মালপত্তর নিয়ে চলে যেতে। ’, বংকুবিহারী বলেন।

‘হ্যাঁ, ছেলে বদলি হয়ে গেছে।’
‘বদলী হয়ে গেছে? কোথায়?’
‘দিল্লী’
‘তা আপনি কি করবেন?’
‘কিসের?’
‘খাওয়া-দাওয়ার?’
সুধাময় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন, ‘ও নিজে করে নেবো এখন। দুমুঠোতো খাওয়া। তার আবার।’
‘আপনি ওদের সঙ্গে গেলে পারতেন।’
‘দূর! আজ শেষ বয়সে আর নিজের জন্মভূমি ছাড়তে পারবোনা। এখানেই যেন মরি।’

কাল বিকেল থেকে সুধাময় ঘুমঘুমে জ্বরটা টের পাচ্ছিলেন। গা করেননি ছোটখাটো অসুখ বিসুখে তিনি পাত্তা দেন না। কখনও দেন নি। আজও নয়। শকুন্তলা বলে বলে হার মেনেছিলেন।

আজ ঝিল থেকে বাড়ি ফেরার পর জ্বরটা তীব্র বোধ হতে থাকে। মাথার মধ্যে প্রচন্ড যন্ত্রনা অনুভব করেন। গা-হাত-পায়ে ব্যাথা।

আজ সকালে নিজেই ভাত রান্না করে খেয়েছিলেন। শকুন্তলা বেঁচে থাকতে তাঁর কাছ থেকে সাধারণ কয়েকটা পদ রান্না করা শিখে নিয়েছিলেন। শকুন্তলা হালকা ভাবে বলতেন, ‘রান্না শিখে নাও। আমি যখন মরে যাবো, তখনতো নিজেকে রান্না করে খেতে হবে।’ তা সেই রান্না শেখাটা এখন কাজে লাগছে। বিকেলে চা-টা অবস্য রমলাই করে দিয়ে গিয়েছিল।

আজ রাতের রান্নাটা করা আছে।

কিন্তু সুধাময় অত্যন্ত দূর্বলতা বোধ করছেন। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। রান্নার জায়গায় তাকে বোয়মে কয়েকটা বিস্কিট দেখতে পান। তাই খান। তারপর ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল।

শোয়ার ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালে শকুন্তলার একটি বাঁধানো ফটো। অনেকদিনের পুরোনো। সাদা-কালোয়। এখন বিবর্ণ হয়ে গেছে। এই ফটোটায় শকুন্তলার বড্ড মায়া ছিল। বিয়ের কিছুদিন বাদে সুধাময় নিজের হাতে এই ছবিটা তুলেছিলেন। সুধাময়ের নিজের হাতে শকুন্তলার প্রথম তোলা ছবি। মায়া হয়তো সেই কারণেই। তাই শোয়ার ঘরে খাটের কাছে এত দিন ধরে টাঙ্গানো রয়েছে। সরানো হয়নি।

অসুস্থ শরীর নিয়ে সুধাময় সেই ফ্রেমে বাঁধানো ফটোটার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তাকিয়ে থাকেন। তাঁর দু-চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

হঠাৎ তাঁর মনে হয়, ফ্রেমের ভেতর থেকে শকুন্তলা জিজ্ঞেস করলেন,'কেমন আছো?'

সুধাময় কেঁদে ফেলেন, 'আমি ভালো নেই, শকু। আমার জ্বর হয়েছে। তোমার ছেলে, ছেলের বৌ আমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেছে।'

এতদিন শক্ত-সমর্থ পুরষটি অবশেষে ভেঙ্গে পড়েন। ঝড়ের দাপটে উড়ন্ত পাখিটি মাটিতে আছড়ে পড়ে।

সমীর কুমার রায়, নিরালা এপার্টমেন্ট, ব্যানার্জি পাড়া, কলকাতা -১৫৪